



বীর শহীদ গঙ্গা চরন রাজবংশী

জন্ম তারিখ:	৮ জুন, ১৯৬৬
শাহাদাতের তারিখ:	৫ আগস্ট, ২০২৪
বিভাগ:	ঢাকা সিটি
জেলা:	ঢাকা

শহীদের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত

পেশা : ড্রাইভার

শাহাদাতের স্থান : রামপুরা ব্রিজ, রামপুরা, ঢাকা

শাহাদাতের বিস্তারিত ঘটনা ও ইতিহাস

একজন শ্রমজীবী নাগরিক, যিনি রাষ্ট্রীয়

নিপীড়নের ছায়ায় ঢেকে গেলেন

গঙ্গা চরন রাজবংশী একটি নাম, এতদিন পর্যন্ত ছিল শুধু এক পুরনো হাইভিজ জ্যাকেটে আটকে থাকা চালকের পরিচয়পত্রে লেখা কিছু শব্দ। একটা নাম, যার ওজন ছিল না রাষ্ট্রের কোনো নথিতে, যার অস্তিত্ব ছিল না সমাজের গর্বের তালিকায়। আজ, মৃত্যুর পরে, সে নামটিই হয়ে উঠেছে এক নীরব বিস্ময়। প্রতিবাদের প্রতীক, যন্ত্রণা ও অবহেলার প্রতিচ্ছবি। জন্ম ৮ জুন ১৯৬৬, পিতা কালু লাল রাজবংশী, মাতা নিপদা রাজবংশী। এই পৃথিবীতে তাঁর আগমন ছিল নিঃশব্দ, তাঁর বিদায়ও হলো এক অবর্ণনীয় নীরবতায়। পেশায় তিনি ছিলেন একজন ড্রাইভার। তা কোনো গর্বের পেশা নয় এই সমাজে। কিন্তু তাঁর গর্ব ছিল তাঁর পরিবার। পরিবারটি থাকত ঢাকার বৈঠাখালি, মধ্য বাড্ডার ভাঙাচোরা এক ভাড়া বাড়িতে। যেখানে টিনের চাল ফুটো হলে বর্ষীয় ঘরের ভিতরে ফোঁটা ফোঁটা করে জমত কষ্টের জল। যেন কোনরকম দিনাতিপাত। কোনো কিছু হাতে এলে রান্না হত, না এলে ঘরের বাতি নিভে যেত অনাহারের অন্ধকারে। কেউ জানত না তাঁদের গল্প, কেউ শুনত না তাঁদের কান্না। কারণ এই পরিবার “গরিব”, আর গরিবদের গল্প হয় না। গরিবরা শুধু সংখ্যা।

তাঁর বড় ছেলে মিতু রাজবংশী, বয়স ৩২, এখনো বেকার। ছোট ছেলে বিশ্বজিৎ (২৫) বি.এ পড়ছে আবুজর গিফারী কলেজে। পড়ালেখার খরচ যোগাতে বাবাকে কত রাত, ভোর পর্যন্ত বাস চালাতে হয়েছে সেই ক্লান্তির হিসেব কোনো নথিতে নেই। সরকারের চোখে কিংবা সংবাদপত্রের পাতায়ও নেই। শুধু ছিল এক নিঃসঙ্গ হৃদয়ের ব্যস্ততা ও পরিবারের মুখে হাসি ফোটানোর সংগ্রাম।

আর তারপর হঠাৎ একদিন, এক গুলির শব্দ থামিয়ে দিল সেই সংগ্রাম। গঙ্গা চরন শহীদ হলেন, তবে কোনো স্বীকৃতি ছাড়া, কোনো তদন্ত ছাড়া। পোস্টমর্টেম হয়নি কারণ তিনি “ড্রাইভার”। তাঁর লাশ নিয়ে পরিবার থানায় গেলে পুলিশ আমলে নেয়নি। শেষে কাউন্সিলরের সুপারিশপত্র নিয়ে শ্মশানে যেতে হয়। মৃত্যুর পরেও তাঁকে “যাচাই করে” মরতে হয়। রাষ্ট্র তাঁকে চিনল না, সমাজও নয়। অথচ তাঁর রক্তে মিশে আছে মধ্যবিত্তের নীরব ক্রন্দন, নিম্নবর্গের আত্মনা। এই মৃত্যু শুধু একটি দেহ থামিয়ে না। এই মৃত্যু থামিয়ে দেয় শ্রেণীসংগ্রামের এক অলিখিত ইতিহাস। সে ইতিহাসে লেখা থাকে, কীভাবে এক মানুষকে জীবদ্দশায় উপেক্ষা করা হয়, আর মৃত্যুর পরেও তাঁকে প্রাপ্য সম্মান দেওয়া হয় না। গঙ্গা চরন রাজবংশী আজ নেই, কিন্তু তাঁর নাম লেখা রইল। একটি হারিয়ে যাওয়া শ্রেণির প্রতিনিধি হয়ে, নীরব শহীদের তালিকায়, যেখানে প্রতিটি নাম একেকটি অজানা অভিশাপ হয়ে বাতাসে ভাসে।

আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

গঙ্গা চরনের মৃত্যু কোনো দুর্ঘটনা ছিল না। এটি ছিল একটি রাষ্ট্রীয় লাশের রাজনীতি। নরম জুতোয় হাঁটা এক নির্মম ফ্যাসিবাদের নগ্ন উদাহরণ। ২০২৪ সালের জুলাই, বাংলাদেশের ইতিহাসে রক্তমাখা একটি মাস। সেদিনের রোদ যেন ছিল বিদ্রোহের আগুনে জ্বলা, বাতাসে মিশে ছিল দীর্ঘদিনের চাপা কান্না। ১৫ বছরের আওয়ামী শাসন তখন সর্বগ্রাসী হয়ে উঠেছে। দুর্নীতি, গুম, ভোট ডাকাতি, বিচারহীনতার মহোৎসব চলছিল খোলাখুলি। আদালত ছিল বন্দি। সাংবাদিকেরা নিঃশব্দ। আর পুলিশ বাহিনী যেন ক্ষমতার বেসরকারি আর্মি।

এই নিপীড়নের বিপরীতে উঠে দাঁড়িয়েছিল কোটা সংস্কার আন্দোলন। প্রথমে নেহাত ছাত্রদের দাবি মনে হলেও, তাতে খুব দ্রুত রক্ত মিশে যায় দেশজুড়ে সাধারণ মানুষের। কেননা এই আন্দোলন ছিল শুধুই শিক্ষানীতির জন্য নয়, এটি ছিল সমগ্র রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক ব্যথিত চিৎকার। শহীদ আবু সাঈদের রংপুরে হত্যার পর, আর তা ছাত্রদের আন্দোলন থাকে না—তা হয়ে ওঠে এক গণবিদ্রোহ। শ্রমজীবী, বেকার, শিক্ষক, নার্স, অবসরপ্রাপ্ত সেনা, দিনমজুর, এমনকি রিকশাচালকও তাতে শরিক হন। এই আন্দোলনের উত্তাপে জেগে উঠেছিল গঙ্গা চরনের মতো মানুষ, যাদের প্রতিদিনই এক জীবনমরণ যুদ্ধ।

গঙ্গা চরণ যিনি কোনো সংগঠনের নেতা ছিলেন না, কোনো দলীয় কর্মী ছিলেন না। তিনি ছিলেন সেই নিরব বিপ্লবীর প্রতিচ্ছবি, যার শরীরে ঘাম জমত সারাদিনের পরিশ্রমে, আর মন ভেঙে যেত ছেলেদের মুখে খাবার না দিতে পারলে। কিন্তু তাঁর হৃদয় বুঝেছিল এই লড়াই শুধু কোটা সংস্কারের না, এটি বৈষম্যের বিরুদ্ধে, এটি সেই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে, যে রাষ্ট্র সবসময় গরিবকে গোনে না, খেয়াল করে না, শেষমেশ গুলি করে থামিয়ে দেয়।

তাই তিনি দাঁড়িয়েছিলেন হয়তো একা, হয়তো নিরবে। কিন্তু দাঁড়িয়েছিলেন সেই দিন দক্ষিণ বনশ্রীর মোড়ে, যেখানে ছাত্রদের মিছিল হঠাৎ থমকে গিয়েছিল পুলিশের ব্যারিকেডে। সেখানে

গুলি চলে। আর সেই গুলি লাগে গঙ্গা চরণের ঠোঁটের বাঁ পাশে। কেউ জিজ্ঞেস করেনি কেন তিনি সেখানে ছিলেন। রাষ্ট্র জবাব দেয়নি। কিন্তু উত্তর ছিল রক্তে লেখা। তিনি ছিলেন- কারণ এটা তাঁর লড়াইও ছিল। রুটি, ন্যায্যতা, স্বাধীন, এবং জীবিত থাকার অধিকার এই সব কিছুই তিনি নেমেছিলেন রাস্তায়।

এ দেশে এখন দাঁড়ানোতেও গুলি লাগে। প্রশ্ন করলেও গুলি লাগে। কিছু না করলেও গুলি লাগে, যদি তুমি গরিব হও, শ্রমিক হও, দলবিহীন হও। গঙ্গা চরণের মৃত্যু সেই নির্মম বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি। যেখানে লাশ পড়ে থাকে রাস্তায়, কিন্তু ইতিহাস জেগে ওঠে জনতার হৃদয়ে। জুলাইয়ের বিদ্রোহ ছিল গঙ্গা চরণেরও বিদ্রোহ। একজন সাধারণ মানুষের বুক দিয়ে লেখা অসাধারণ প্রতিবাদের কাহিনি।

এই আন্দোলনের ইতিহাস তাঁকে কখনো ভুলবে না, যেমন করে বাতাস ভুলে না বাড়ের গর্জন।

যেভাবে শহীদ হন

১৮ জুলাই, ২০২৪। ঢাকার রামপুরা ব্রিজ তখন বিপ্লবের ঝাঁবে উত্তপ্ত। চারদিকে পুলিশের ঘিরে রাখা রাস্তা, ছাত্রদের মিছিলের গর্জন, আর মাথার ওপরে নির্দয় সন্ধ্যার ছায়া। শহর যেন দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। একদিকে শোষণ, অন্যদিকে প্রতিবাদ। আর ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন গঙ্গা চরণ রাজবংশী। একজন নিরীহ শ্রমিক, যিনি হয়তো সেদিন বাসা ফিরছিলেন, অথবা থেমে দাঁড়িয়েছিলেন কিছু সময়ের জন্য, দেখে নিতে কী ঘটে যাচ্ছে তাঁর দেশটাতে।

তাঁর হাতে ছিল না কোনো ব্যানার, মুখে ছিল না কোনো স্লোগান, তবুও গুলি এসে লাগে তাঁর শরীরে। হঠাৎ এক এলোপাখাড়ি গুলিবর্ষণে হঠাৎ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। রক্তে ভেসে যায় রাস্তাটুকু। চারপাশের হাহাকার আর পুলিশের বুটের শব্দ মিলে এক বিভীষিকাময় গর্জনে রূপ নেয়।

তবে মৃত্যু তাঁর জন্য সহজ আসেনি। গঙ্গা চরণ লড়েছেন, ১৮ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত টানা ১৮ দিন। এই সময়টা ছিল এক নীরব যুদ্ধক্ষেত্র, আইসিইউর নিঃসঙ্গতা, দেহের প্রতিটি কোষের সঙ্গে লড়াই, রাষ্ট্রের নির্লিঙ্গতা, এবং পরিবারের হতবিস্বল কান্নার এক নির্মম প্রেক্ষাপট। চিকিৎসা ঠিকভাবে হয়নি, সংবাদমাধ্যম তেমন কিছু বলেনি, পুলিশ তো একবারের জন্যও মুচকি ক্ষমাও চায়নি।

তাঁর সন্তানেরা হাসপাতালের করিডোরে কেবল প্রার্থনা করে গেছে, "আব্বা একটু চোখ মেলে দেখেন, আমরাই আছি।" কিন্তু সাড়া আসেনি। চিকিৎসা ব্যয় চালাতে গিয়ে পরিবার দেউলিয়া। রক্ত দিলেন প্রতিবেশীরা, ওষুধের পয়সা জোগাতে বন্ধক পড়লো স্ত্রীর সোনার কানের দুল। কিন্তু রাষ্ট্র? রাষ্ট্র ছিল নিঃশব্দ, যেন এ মৃত্যুতে তার কিছু যায় আসে না।

৫ আগস্ট, ২০২৪, একটি শববাহিনী হাসপাতাল ছাড়ে, যেখান থেকে জীবিত কেউ আর ফিরবে না জানে সবাই। কোনো রাষ্ট্রীয় শোক নেই, নেই কোনো প্রতিবাদের ব্যানার, কেবল ছোট করে লেখা, "ড্রাইভার গুলিতে আহত, ১৮ দিন পর মারা যান" সংবাদপত্রের এক কোণে।

পুলিশ এই মৃত্যু নিয়ে তদন্ত করেনি। মৃত্যুর পরও পরিবারকে লাশ নিয়ে করতে হয় দরজায় দরজায় ঘোরা। থানা নেয়নি, হাসপাতাল চাপ দেয় না বলতে, শেষে কাউন্সিলরের লিখিত অনুমতি নিয়ে পোস্তাগোলা শ্মশানে দাহ করতে হয়। এই মৃত্যু শুধু একটি জীবন থামায়নি, থামিয়েছে আমাদের সভ্যতার মুখোশটাও।

একজন মানুষ যখন রাস্তায় গুলি খায়, ১৮ দিন বাঁচার চেষ্টা করে, আর আমরা কেবল তাকিয়ে থাকি—তখন বুঝতে হয়, বিপ্লব দরকার। এই মৃত্যু কেবল একটি ট্রাজেডি নয়, এটি রাষ্ট্রীয় পাপের ক্যানভাসে আঁকা এক অসীম আত্মদান। গঙ্গা চরণ ছিলেন না কোনো রাজনৈতিক নেতা, ছিলেন না কোনো সংগঠনের মুখপাত্র—তবু তিনি হয়ে ওঠেন বিপ্লবের সলিলচিত্র।

তাঁর মৃত্যুর প্রতিটি মুহূর্ত যেন বলে- "তোমরা চুপ করে থেকো না। কারণ কাল তোমার গায়েও লাগতে পারে সেই গুলি, যেটি আজ গঙ্গা চরণের শরীর ভেদ করে গেছে।"

পরিবার ও বেদনাভরা বাস্তবতা

পরিবার ও বেদনাভরা বাস্তবতা, এই শব্দগুলো যেন মিথ্যে এক মধুরাস, যা গঙ্গা চরণ রাজবংশীর পরিবারের কাছে পৌঁছতে পারে না, বা পৌঁছালেও তাতে কিছু পরিবর্তন হয় না। "নাজুক" বলার মাধ্যমে আমরা যেন তাদের করুণ অবস্থার ঠিক মূলে হাত দিতে পারি না, আসলে সত্যিটা সে চেয়ে অনেক গভীর, অনেক ধ্বংসস্তূপের গন্ধ মিশানো। গঙ্গা চরণ রাজবংশীর পরিবার আজ অস্তিত্বের খামারে যেন একটা ম্লান আলো হিসেবে টিকে আছে, যা গলে যাচ্ছে ধীরে ধীরে হতাশা আর দারিদ্র্যের চাপে।

তিনটি ছোট প্রাণ, তাদের চোখে এখন কেবল অন্ধকারের রাজত্ব। বড় ছেলে মিঠু, তরুণ বয়সে কাজের অভাবে হেঁটে বেড়ায় একটি ভিন্ন পৃথিবীর সন্ধানে, যেখানে লাঠির বদলে একটা লেন্স থাকে, যেখানে রুটি থেকে বেশি কিছু জোটে, কিন্তু সে পৃথিবী যেন তাঁর জন্য ছিল না। আর ছোট ছেলে কলেজের ক্লাসরুমে বসে শূন্যতার মধ্যেই হারিয়ে যাচ্ছে। একটা ভবিষ্যৎ, যা আজ শুধুই কফিনের স্মৃতির ছায়ায় ঢাকা।

গঙ্গা চরণের ভাই নিশার মুখ থেকে যখন বেরিয়ে আসে সংস্কারের স্মৃতি, সেই মুহূর্তে যেন সমস্ত রক্তক্ষরণের ব্যথা মিশে যায় গলায়। থানায় গিয়ে যখন তারা সাহায্যের আশায় হাত বাড়িয়েছিল, তখন পুলিশ তাদের দৃষ্টি ছিল কেবল কাগজের ফাঁকে। ময়নাতদন্তের আদর্শ কথা তো দূরের কথা, সেখানে গঙ্গার রক্তের কোনো হিসাবও নেওয়া হয়নি। কাউন্সিলরের একটি সনদ দিয়েই তারা সংস্কার সম্পন্ন করেছে। যা রাষ্ট্রের এক কঠোর ঘোষণা, "আমরা তোমাদের মৃত্যু স্বীকার করি না।"

এই অবহেলা, এই নিঃশব্দ উপেক্ষা যা আজকের সমাজের নিম্নবিস্তার কষ্টের প্রতিচ্ছবি, সেখানে গঙ্গার পরিবার যেন একাকী। চাঁদার কোন দরকার নেই তাদের, প্রতিদানের কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই, শুধু চাই শান্তি, চাই ন্যায্যবিচার, চাই সম্মান। একটি প্রাথমিক মানবিক অধিকার, যা রাষ্ট্রকে তাদের দিতে হবে। গঙ্গা চরণ ছিলেন কোনো রাজনৈতিক নেতা না, ছিলেন না কোনো দলের মুখ; তিনি ছিলেন জনতার একজন অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাঁর শরীরের গুলির চিহ্ন সেই গল্প বলে দেয়। জনতার রক্তেই লেখা আছে ইতিহাসের সব অধ্যায়, কিন্তু আজ সেই রক্ত মাটির মধ্যে ঝরে যায় অজানায়, অস্বীকৃতিতে। তার সন্তানদের জীবনের ওপর ভর করে এখন রাষ্ট্রের বিবেক। তারা বাঁচবে কি না, তারা পাড়ি দেবে কি না এই অন্ধকারের থেকে, সেটা এখন আমাদের হাতে। সমাজের নীরবতা, রাষ্ট্রের অবহেলা যদি কাটিয়ে ওঠা যায়, তাহলে হয়তো তারা ফের পাবে জীবনের আলো, নয়তো তারা হারিয়ে যাবে আমাদের ভুলে যাওয়া নিকট অতীতে, একটি শোকের ছায়ায়।

এভাবেই নিপদা রাজবংশীর চোখে ধীরে ধীরে গলে যাচ্ছে স্বপ্ন, নিঃশব্দ নিঃসঙ্গতার মাঝে প্রতিটি দিন কেটে যায় কেবল বেদনার সুরে। পরিবারটির জীবনে আজ শুধু রক্তের স্মৃতি, আর সেই স্মৃতির জ্বালা, যা সময়ের সঙ্গে ধীরে ধীরে গভীর হচ্ছে, আর আমাদের সভ্যতার প্রতিচ্ছবি হয়ে রয়ে যাচ্ছে। যেখানে মানবতার শেষ সীমা লগ্নভঙ। এতটাই নিষ্ঠুর এই বাস্তব, যে যেখানে এক মানুষের মৃত্যু আজ হয় অস্বীকৃতির কারণ, সেখানে আমরা সবাই হারিয়ে যাচ্ছি মানবিকতার গ্লানি আর অবহেলার জালে।

প্রস্তাবনা ও শহীদের উত্তরাধিকার

গঙ্গা চরণ রাজবংশীর শহীদত্ব যেন কখনো হারিয়ে না যায় গুলির ধোঁয়ার আঁধারে, যেন তার নাম শুধু স্মৃতিপটে নয়, জীবন্ত অনুপ্রেরণার আলো হয়ে জ্বলজ্বল করে থাকে। এই মানুষটির

আত্মত্যাগ আমাদের প্রত্যেক দিন সতর্ক করে দেয়। সাধারণ মানুষের জীবন রাষ্ট্রের কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাদের অস্তিত্বও সমান মূল্যবান, তাদের বেদনা ও স্বপ্নও রাষ্ট্রের দায়িত্ব। তাঁর সন্তানেরা যেন অচেনা, অজানার কোণে হারিয়ে না যায়, সেই জন্য জরুরি সরকারি বৃত্তির মাধ্যমে তাঁদের পড়াশোনার পথ সুগম করা। শুধু বইয়ের পাতা নয়, তাদের ভবিষ্যতকে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন পৃথক শিক্ষাব্যবস্থা, যেখানে তারা যেন অনুপ্রাণিত হয়, স্বপ্ন দেখে, এবং নিজের ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছায়।

শহীদ সন্তানের জন্য আর্থিক সহায়তা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা হোক যেন তা হয় রাষ্ট্রের কর্তব্য, ন্যায়ের মুখপাত্র। এই সহায়তা যেন করুণা বা দয়ায় মনোভাবের ফলাফল নয়, বরং জাতির এক শোধপূর্ণ স্বপ্ন, যা আমরা শহীদদের কাছে চুকিয়ে দিতে বাধ্য। কারণ শহীদ মানে শুধুমাত্র মৃত, নয়; শহীদ মানে জীবন্ত ন্যায়বিচারের স্মারক। একটি অনন্ত প্রতিজ্ঞা যা আমাদের সমাজকে শক্ত করে, ভবিষ্যতকে আলোকিত করে। গঙ্গা চরন রাজবংশীর নাম যেন শুধু ইতিহাসের পাতায় গিলে না যায়, বরং প্রতিটি স্কুল, প্রতিটি কোণে তাদের স্মৃতির দীপ জ্বলিয়ে রাখি। যে দীপ আমাদেরকে বার বার মনে করিয়ে দেয়, যে সাধারণ মানুষের রক্তেই গড়া হয় রাষ্ট্র, আর তাদের মর্যাদা না দিলে রাষ্ট্রের ভিত্তিই হয় দুর্বল। এই প্রস্তাবনা যেন সমাজের হৃদয়ে কড়া নাড়ছে। বলছে, আমরা শহীদদের ভুলিনি, ভুলব না। তাদের উত্তরাধিকার আমরা বরণ করি, সম্মান করি এবং আমাদের সব শক্তি দিয়ে তাদের স্বপ্ন পূরণে কাজ করব। সত্যিই, শহীদরা মারা যান না; তারা আমাদের বিবেকের গভীরে থেকে জীবিত থেকে যায়, একটি জ্বলন্ত বাতি যা সমাজকে তার অন্ধকার থেকে মুক্তি দেয়। এখন সময় এসেছে, গঙ্গা চরনের স্মৃতি দিয়ে শুরু করে আমরা সকল শহীদদের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা নতুন রূপে প্রতিষ্ঠিত করি। কেবল স্মরণ করাই নয়, তাদের উত্তরাধিকার নিশ্চিত করাই হলো আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য।

একনজরে শহীদ সম্পর্কিত তথ্যাবলি

নাম : গঙ্গা চরন রাজবংশী, পেশা: ড্রাইভার

জন্ম তারিখ : ৮ জুন, ১৯৬৬

পিতা : কালু লাল রাজবংশী

মাতা : নিপদা রাজবংশী

পরিবার : ৩ সন্তান (মিঠু, বিশ্বজিৎ), স্ত্রী নিপদা

বর্তমান ঠিকানা : গ্রাম: পোস্ট অফিস গলি, বৈঠাখালি, মধ্য বাড্ডা, ঢাকা

আক্রমণকারী : পুলিশ

আহতের সময় : ১৮ জুলাই, ২০২৪, সন্ধ্যা ৭:৩০টা

মৃত্যুর তারিখ : ৫ আগস্ট, ২০২৪, দুপুর ১:৩০টা

মৃত্যুর স্থান : রামপুরা ব্রিজ, রামপুরা, ঢাকা

দাহস্থল : পোস্টাগোলা মহাশ্মশান

একনজরে প্রস্তাবনা

শহীদ পরিবারে এককালীন সহযোগিতা করা যেতে পারে।

শহীদদের বড় ছেলেকে কর্মসংস্থান করে দেওয়া যেতে পারে।

শহীদদের ছোট সন্তানকে শিক্ষাবৃত্তির আওতায় নেওয়া দরকার।

মিডিয়ায় প্রকাশিত শহীদদের নিউজ লিঙ্ক

<https://www.facebook.com/share/p/1X6ck4Nqgh/>

<https://www.newagebd.net/post/country/250366/the-road-home-that-led-to-death>

পবিত্র কুরআনের বাণী

আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনোই মৃত মনে করো না; বরং তারা জীবিত এবং তাদের রবের কাছ থেকে তারা জীবিকা-প্রাপ্ত হয়ে থাকে। (সূরা আল-ইমরান ৩:১৬৯)

হাদীস শরীফ

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “শহীদদের আত্মা সবুজ পাখির পেটে থাকে।” (সহীহ মুসলিম ১৮৮৭)

দোয়া পাঠ: ২ জন

শহীদের স্মৃতিচিত্র ও ফটো গ্যালারি



পোস্টমর্টেম ছাড়াই সংকার
শেষ পৃষ্ঠার পর
হয়নি। ফলে তারা রাজবংশীর লাশ
পূর্ব বাড্ডায় নিজের এলাকায় নিয়ে
যান।
গতকাল শুক্রবার পোস্টমর্টেম
ছাড়াই স্বজনরা রাজবংশীর লাশ
শ্যামপুর পোস্তগোলা শ্মশানে নিয়ে
সংকার করেন। ভাই নিশা জানান,
সংকারের আগে তারা বাড্ডা থানায়
গিয়েছিলেন বিষয়টি জানাতে। কিন্তু
পুলিশ আমলে নেয়নি। পড়ে তারা
স্থানীয় কাউন্সিলরের অনুমতি ও সনদ
নিয়ে লাশের সংকার করেন।
রাজবংশী ছিলেন তিন সন্তানের
বাবা। তার বাবার নাম কানন
রাজবংশী। পূর্ব বাড্ডায় তাদের বাড়ি।

